রাধামোহন ভট্টাচার্য

সোমেশ্বর ভৌমিক*

১৯২৮ সালের কথা। প্রেসিডেন্সি কলেজের একদল উৎসাহী ছাত্র রবীন্দ্রনাথের *মুক্তধারা* নাটকটি (১৯২৪ সালে প্রকাশিত) অভিনয় করবেন মনস্থ করে কবির কাছে আবেদন জানালেন। আবেদন শুধু যে মঞ্জুর হল তাই নয়, কবির পক্ষ থেকে অভাবিত এক আমন্ত্রণও এসে পৌঁছল ছাত্রদের কাছে। তারই সুবাদে প্রার্থী ছাত্রের দল একদিন জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা ভবনে গিয়ে স্বয়ং কবির মুখ থেকে সম্পূর্ণ নাটকের অভিনয়োদ্দিষ্ট পাঠ শুনলেন। এমনকি নাটকে সংযোজিত গানগুলিও নিজে গেয়ে শোনালেন কবি! সারাজীবন দুর্লভ এই অভিজ্ঞতার রেশ বহন করেছেন রাধামোহন ভট্টাচার্য (জন্ম : সেপ্টেম্বর ১৯০৮, মৃত্যু : জানুয়ারি ১৯৮৩), যিনি ছিলেন সেই দলেরই একজন, প্রেসিডেন্সি কলেজের সাম্মানিক অর্থনীতির ছাত্র। এখানে বলে রাখা ভাল, ছাত্রদের সেই নাট্যাভিনয়ে মঞ্চে ওঠার সুযোগ হয়নি রাধামোহনের। সংগীতের প্রয়োজনে উইংসের আড়াল থেকে হারমোনিয়াম বাজিয়েছিলেন তিনি। তখনো অভিনয়কে পেশা হিসেবে নেওয়ার কোনো পরিকল্পনাও ছিল না তাঁর। কিন্তু বিচিত্রা ভবনের অভিজ্ঞতাই বোধ করি রাধামোহনের অজান্তে বেঁধে দিয়েছিল তাঁর অনাগত ভবিষ্যতের ধ্রুবপদ। চার দশক পরে কবিকৃতির স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে রাধামোহন লিখেছিলেন, "কবিকণ্ঠে সম্পূর্ণ *মুক্তধারা-র* অভিনয় শোনার অভিজ্ঞতার বর্ণনা করতে পারব না। একচল্লিশ বছর পরেও অম্বার 'সুমন, আমার সুমন' মনে করলে বুক গুরুগুরু করে ওঠে।" আমাদের অবশ্য মনে হয়, সেদিনের রবীন্দ্র-সান্নিধ্যের প্রভাবেই বছর পনের পরে সম্পূর্ণ অপ্রচলিত, এবং অননুকরণীয়, এক অভিনয়রীতির জন্ম দিয়েছিলেন রাধামোহন।

রাধামোহন-রূপায়িত চরিত্রে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আর পেশীসঞ্চালনের ভূমিকা সীমিত। সেখানে মূল ঝোঁকটা পড়ে এক বিশেষ ধরনের বাচনভঙ্গীতে। স্পষ্ট উচ্চারণের পাশাপাশি সংলাপকে আলঙ্কারিক সুষমায় মণ্ডিত করায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন রাধামোহন। জীবনের প্রথম উল্লেখযোগ্য কাজ বিমল রায় পরিচালিত *উদয়ের পথে* ছবিতে (১৯৪৪) আদর্শবাদী শ্রমিকদরদী অনুপের চরিত্রে অভিনয়ের সময় শাণিত সংলাপের দার্ঢ্যের সঙ্গে অনায়াসে মিশিয়ে দিয়েছিলেন এক পরিশীলিত বাচনভঙ্গী। ব্যতিক্রমী সেই বাচনরীতিতে সামান্য সুরেরও ছোঁওয়া থাকত। অভিব্যক্তির এই বিশিষ্টতা বাংলা সিনেমার গড়পড়তা চরিত্র চিত্রনের পক্ষে খুব মানানসই ছিল না। প্রায় চল্লিশ বছরের অভিনয় জীবনে খুব বেশি হলে ত্রিশটি ছবিতে অভিনয় করেছিলেন রাধামোহন। অবশ্য মাঝে চার বছর (১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত) অভিনয় জগৎ থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন।

চলচ্চিত্রে তাঁর অভিনয় জীবনের সূত্রপাত খলনায়কের ভূমিকায়। ফণি মজুমদার পরিচালিত উপর্যুপরি দুটি ছবিতে। তিনি স্বমহিমায় দেখা দিলেন *উদয়ের পথে* ছবিতে। এই ছবির হিন্দি সংস্করণ *হাম্‌রাহী*-তেও একই ভূমিকা ছিল তাঁর। এরপর থেকে তাঁর দ্বারা রূপায়িত প্রায় প্রতিটি চরিত্রই এক সহজ আভিজাত্যে মহীয়ান্। যেমন হেমেন গুপ্ত পরিচালিত *ভুলি নাই* ছবিতে (১৯৪৮) মাস্টারদা (চট্টগ্রামের প্রবাদপ্রতিম বিপ্লবী সূর্য সেনের আদলে তৈরি চরিত্র), তপন সিংহ পরিচালিত *কাবুলিওয়ালা* ছবিতে (১৯৫৭) লেখক, *ক্ষণিকের অতিথি* ছবিতে (১৯৫৯) কনসাল্‌ট্যান্ট সার্জন, *ক্ষুধিত পাষাণ* ছবিতে (১৯৬০) করিম খাঁ, *ঝিন্দের বন্দী* (১৯৬১) ছবিতে সর্দার, অগ্রগামী পরিচালিত *কান্না* (১৯৬২) ছবিতে খ্রিস্টান যাজক, মঙ্গল চক্রবর্তী পরিচালিত *ন্যায়দণ্ড* ছবিতে (১৯৬৩) বিচারক। মৃণাল সেনের *আকালের সন্ধানে* ছবিতে (১৯৮২) জীবনে শেষবারের মতো পর্দায় এসেছিলেন এক বিবেকরূপী চরিত্রে।

**প্রাক্তন ছাত্র ১৯৭৩-৭৬ (অর্থনীতি)*

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

মঞ্চ-অভিনয়ে কিছু অভিজ্ঞতাও ছিল তাঁর। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ১৯৪৫ সালে রবীন্দ্রস্মৃতি ভাণ্ডারের জন্যে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে শ্রীরঙ্গম ও কালিকা রঙ্গমঞ্চে *চিরকুমার সভা*-র দুটি অভিনয়। রাধামোহন ছিলেন পরিচালক। মুখ্য ভূমিকায়ও তিনিই অভিনয় করেছিলেন। ১৯৬০ সালে বিশ্বরূপায় *ডাউন ট্রেন* নাটকে স্টেশন মাস্টারের ভূমিকায় অভিনয় করে শ্রেষ্ঠ মঞ্চাভিনেতার পুরস্কার পেয়েছিলেন। ১৯৭৭ সালে স্টার থিয়েটারে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের *অলীকবাবু* নাটকে অভিনয় করেছেন বাংলা চলচ্চিত্রে প্রথিতযশা পরিচালক-অভিনেতা ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের (ডিজি) সঙ্গে।

শেষ বয়সে (১৯৭২ সালে) অসামান্য এক আত্মপ্রতিকৃতি এঁকেছিলেন রাধামোহন—অবশ্য রেখায় নয়, লেখায়। সেই সাক্ষ্য পড়লে বোঝা যায় তাঁর অভিনীত চরিত্রগুলির অধিকাংশ তাঁর ব্যক্তিত্বেরই প্রতিচ্ছবি। তাঁর কথায়:

> আমার নাক উঁচু, মাথা উঁচু। দৈহিক এবং আলঙ্কারিক অর্থে। সম্পূর্ণ দায়ী আমি নই। বেশি দায়ী পিতৃকুল, মাতৃকুলের পরম্পরাগত 'জিন', এবং অভিভাবকের আদর্শে ও খরচে শিক্ষাদীক্ষা। এর ফলে ব্যক্তি সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিষ্ট, লোভনীয়, বিস্ময়কর। পেশা সম্পর্কেও মোটামুটি তাই। ত্রিশ বছরে আমি বড়জোর ত্রিশখানা ছবিতে অভিনয় করেছি। অধিকাংশই আমি নায়ক কিংবা সবচেয়ে মনে রাখার মতো চরিত্র। দীর্ঘ সময়ে ছবির সংখ্যার রেকর্ড অন্যদের তুলনায় নগণ্য।
>
> সাধারণত ছবির ইউনিটে পরিচালককে প্রায় সবাই দাদা বলে। আমার বেলায় কিন্তু মাত্র চারটিতে পরিচালকের সঙ্গে পরস্পর সম্বোধন ছিল আপনি, বাকি সবগুলোতে পরিচালকই আমাকে বলেছেন দাদা, আপনি—আমি বলেছি তুমি। একদিকে ছিল বয়োজ্যেষ্ঠর প্রতি সম্মান, হয়তো বা শ্রদ্ধাও। অন্যদিকে ছিল আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্নেহ। প্রথম কাহিনীচিত্র থেকেই।—এটি কিন্তু হবার হলে আপনি হয়। চাইতে হয় না, চাইলেও হয় না।

নিছক ব্যক্তিত্বের ভারেই যে রাধামোহন পেশাগত সহকর্মীদের সম্ভ্রম আদায় করেছিলেন তা নয়। পেশাজগতে তো বটেই, সমাজের অন্য ক্ষেত্রেও তাঁর মান্যতার প্রধান কারণ ছিল তাঁর ব্যক্তিতের বহুমাত্রিকতা, বহুমুখিনতা। নিজের মেধা মনন আর ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে খুব সহজেই তিনি বেছে নিতে পারতেন তথাকথিত সম্ভ্রান্ত ও অর্থকরী পেশার নিশ্চিন্ত আশ্রয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় বর্ধমান বিভাগে প্রথম স্থানাধিকারী রাধামোহন আই এ পরীক্ষায় পেয়েছিলেন দ্বিতীয় স্থান। বি এ পাশ করেছিলেন সাম্মানিক বিষয়ে অর্থনীতি নিয়ে। পারিবারিক অসুবিধার জন্য এম এ পরীক্ষা না দিয়ে পাটনা ল কলেজে থেকে বি এল পরীক্ষায় বসে দ্বিতীয় হন। ভেবেছিলেন বাবার মতো আইনজীবী হবেন। কিছুদিন পাটনা, তারপর মেদিনীপুরে শিক্ষানবিশিও করেছিলেন। কিন্তু একেবারেই পছন্দ হয়নি এই পেশা। এরপর দীর্ঘদিন দেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন আর সেইসব অভিজ্ঞতার কথা কাগজে লিখেছেন। কিন্তু অচিরেই বুঝতে পারলেন, এভাবে নিয়মিত অর্থ উপার্জন সম্ভব নয়। এরপর কখনো পাঞ্জাবে কাঠের গুদামে ম্যানেজারি করেছেন, কখনো বম্বের বিজ্ঞাপন-চিত্রে একস্ট্রা সেজেছেন। তাতে কমবেশি উপার্জন হয়েছে কিন্তু মন ভরেনি। এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সরকারি দপ্তর বা সওদাগরি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করার মতো গতানুগতিক রাস্তায় হাঁটেননি রাধামোহন। এইসব কাজের পক্ষে বড্ড বেশি স্বাধীনচেতা ছিলেন মানুষটি। অবশেষে উনিশশো চল্লিশের দশকে চলচ্চিত্র-অভিনয়ে থিতু হলেন তিনি। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অভিনয়কেই পেশা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু নিজেকে এই পেশার মায়াজালে বন্দী করে ফেলেননি কখনো। তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থেই একজন জীবনশিল্পী এবং জীবনরসিক।

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

তাঁর জ্ঞানচর্চার প্রধান ক্ষেত্র ছিল চলচ্চিত্র নাটক এবং অভিনয় বিষয়ে নিয়মিত অধ্যয়ন, বক্তৃতা আর প্রবন্ধরচনা। তাঁর এইসব প্রবন্ধে বৈদগ্ধ আর সংবেদনশীলতার এক সহজ মিশ্রণ চোখে পড়ার মতো। অবশ্য চলচ্চিত্র নাটক এবং অভিনয় তাঁর পেশার ক্ষেত্র। কিন্তু এই চেনা গণ্ডীর বাইরে গিয়ে সাহিত্য বিজ্ঞান আইন চিকিৎসাশাস্ত্র আয়ুর্বেদ ইত্যাদি বিবিধ বিষয়েও সমান দক্ষতার সঙ্গে লিখেছেন রাধামোহন। লেখাগুলি পড়লে বোঝা যায়, এসব ব্যাপারে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল তাঁর। আবার সম্পূর্ণ অন্য মাত্রার মনন এবং বিশ্লেষণক্ষমতার পরিচয় পাই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে নিয়ে লেখায়। তাঁর অধিকাংশ লেখাই পূর্ববর্তী কোনো-না-কোনো বক্তৃতার ভিত্তিতে লেখা। যাঁরা তাঁর বক্তৃতা শুনেছেন, তাঁদের মনে সঞ্চিত আছে সম্ভ্রমমাখা স্মৃতি। এখন আমাদের সম্বল তাঁরই নির্বাচিত এবং সম্পাদিত কয়েকটি প্রবন্ধের একটি সংকলন। এই লেখাগুলি পড়লেই বোঝা যাবে কতটা গভীর এবং ব্যাপ্ত ছিল তাঁর অনুসন্ধিৎসা।

রাধামোহনের বিচিত্রগামী দক্ষতার আর এক প্রধান অভিমুখ ছিল ভাষা। ইংরেজি, বাংলা আর সংস্কৃত ছাড়াও ফরাসি, জার্মান আর রাশিয়ান নিয়ে বিশেষভাবে চর্চা করেছিলেন তিনি। ১৯৫৭ সালে অনুবাদকের কাজ নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে বিদেশি ভাষার প্রকাশনালয়ে যোগ দিতে তিনি মস্কো চলে যান। অসুস্থতার জন্যে ছ-মাসের বেশি সেখানে থাকা হয়নি তাঁর। কিন্তু তারই মধ্যে ইভান তুর্গেনেভের ১৮৫২ সালে লেখা ছোটগল্প মুমু আর আলেক্সেই টলস্টয়ের ১৯১২ সালে প্রকাশিত *খোঁড়া রাজপুত্র* অনুবাদ করেছিলেন তিনি।

তাঁর ভাষাপ্রীতির চমকপ্রদ নিদর্শন আছে *ক্ষুধিত পাষাণ*-এ। ছবিতে তাঁর মুখে দীর্ঘ একটি উর্দু সংলাপ ছিল। আর ছিল ওমর খৈয়াম রচিত ফার্‌সি কবিতার কলি। প্রথামাফিক দুটি ভাষার একটিও শেখেননি রাধামোহন। কিন্তু ভাষাপ্রেমিক (এবং অভিনয়-শিল্পী) হিসেবে তিনি জানতেন প্রতিটি ভাষার উচ্চারণ প্রাণ পায় বিশিষ্ট কিছু phonetic tone-এর ভিত্তিতে। এক বন্ধুর তত্ত্বাবধানে অল্প সময়ের মধ্যেই সেইসব tone আয়ত্ত করেছিলেন তিনি। তাঁর কুশলী intonation-এর জোরে ছবিতে তাঁর মুখের চোস্ত উর্দু সংলাপ সকলের নজর তো কেড়েইছিল, এমনকি যিনি তাঁকে ফার্‌সি উচ্চারণ শিখিয়েছিলেন তিনিও বিশ্বাস করতে চাননি যে এই মানুষটি একটুও ফার্‌সি জানেন না। Intonation-এর ব্যাপারে এই অধ্যবসায় আর দক্ষতা তাঁকে আবৃত্তিকার হিসেবেও অন্য মাত্রা দিয়েছিল।

জীবনরসিক রাধামোহনের বহুমুখী ক্ষমতার তালিকা এখানেই শেষ নয়। সংগীতশিল্পী যদুভট্টের শহর বিষ্ণুপুরের সন্তান রাধামোহন শৈশব থেকেই পরিচিত হয়েছেন উচ্চাঙ্গ ও লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন ধারার সঙ্গে। খেয়াল ও ধ্রুপদের পাশাপাশি শুনেছেন কথকতা আর রামায়ণগান; দেখেছেন লোকনৃত্য আর যাত্রা। নিজেই লিখেছেন, "কী যাত্রা, কী রামায়ণ, কী কথকতা, কী শ্রেষ্ঠ ওস্তাদের গান কিংবা বাজনা দুচোখ দুকান ভরে গিলতাম। ঘুমে চোখ ঢুলে আসত, তবু কিছুতে নিজে থেকে আসর ছেড়ে উঠতে চাইতাম না। আমাদের সৌভাগ্য যে আমাদের পরিবারে এসব ব্যাপারে পৃষ্ঠপোষকতার উৎসাহ ছিল।" সেই উৎসাহেরই ফসল পাঁচ বছর বয়সে বড়োদের সঙ্গে মঞ্চে উঠে প্রথম অভিনয়। সেই উৎসাহেরই ফসল সেতার, গিটার, এসরাজ, বেহালা আর বাঁশি বাজানোয় তাঁর পারদর্শিতা, আর কণ্ঠসংগীতে দক্ষতা।

এইরকম এক পরিবেশে বড় হয়েছিলেন বলেই মধ্য-ত্রিশে পৌঁছে যখন চলচ্চিত্র অভিনয়কে পেশা হিসেবে গ্রহণ করলেন, তখন কোনো হীনম্মন্যতা তাঁকে গ্রাস করেনি। ছোটবেলায় যাত্রার আসরে শোনা একটি তথাকথিত অর্বাচীন উক্তি স্মরণ করেছেন আমৃত্যু, "উ রং কচ্ছে" অর্থাৎ সেই লোকটি সহজে অন্যদের খুশি করার মতো জিনিস দিচ্ছে। তাঁর উপলব্ধি, "রঙ্গ শব্দের প্রচলিত অর্থের

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

কত কাছাকাছি অর্থদ্যোতক শব্দ ব্যবহার করত অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত লোকেরাও তা ভেবে অবাক হই।" এই উপলব্ধির ভিত্তিতে অভিনয় শব্দের একটি অর্থ রাধামোহন নিজের জীবনের আলোকবর্তিকা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন—অভি+নী+অল্, অর্থাৎ অভিনেতার দিকে দর্শকমনকে নিয়ে যাওয়া, অর্থাৎ আকর্ষণ করা।

অবশ্য শুধু অভিনয়ের জোরে নয়, নিজের ব্যক্তিত্বের জোরেও মানুষকে আকর্ষণ করেছেন রাধামোহন। তাঁর গুণমুগ্ধ চলচ্চিত্র পরিচালক তপন সিংহের কথায়,

> তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা—বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম করা ছাত্র, তাঁর রবীন্দ্রপ্রীতি সর্বজনবিদিত। ইংরেজি এবং সংস্কৃত সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় বহুবার পেয়েছি। তাঁর আর একটি পরিচয় তিনি সংগীতজ্ঞ। কিন্তু কোনো ব্যাপারে প্রশ্ন না করলে উত্তর পাওয়া মুশকিল। কিছুদিন স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকায় চিত্র সমালোচনা করতেন। আমার মতে তাঁর চিত্র সমালোচনা যে-কোনো বিদেশি চিত্র সমালোচকদের সমকক্ষ। একথা জোর করে বলছি। কারণ বিদেশি বহু প্রথম শ্রেণীর ম্যাগাজিনের চিত্র সমালোচনার আমি একজন নিয়মিত পাঠক। সবার ওপরে একজন সদাশয় মানুষ এবং বন্ধু হিসেবে একজন সত্যিকারের বন্ধু। ডাক দিলেই সুখে-দুঃখে হাজির, না ডাক দিলেও হাজির।...প্রতিভাবান মানুষটির এমন স্মরণশক্তি যে ইচ্ছে করলে ওঁর পক্ষে হাইকোর্টের জজ বা আই সি এস হওয়া কিছুই শক্ত ছিল না। কিন্তু ওসব কথা তুললে বলেন, কি হবে হে—তার চেয়ে চল এক হাত ফিশ খেলা যাক্।

তাঁকে যারা চিনতেন তাঁরা জানেন, এ কোনো দুঃখবিলাস বা অভিমান নয়—সহজভাবে জীবনকে গ্রহণ আর উপভোগ করার বিরল এক মানসিক শক্তি। কোনো গরিমার মোহ আচ্ছন্ন করেনি তাঁকে, পেয়ে বসেনি নিজেকে জাহির করার উদগ্র বাসনা। একটু চাপা স্বভাবের মানুষ, তাই অনেকে ভাবত দাম্ভিক। কিন্তু প্রাথমিক আড় ভেঙে গেলে মিশতে পারতেন ঘনিষ্ঠভাবে। প্রকাশ পেত তাঁর মনের উষ্ণতা। আর তখনই বোঝা যেত, রাধামোহন ভট্টাচার্য ছিলেন সত্যি অর্থেই জীবনপুরের পথিক।

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073